অর্থ নয়, বৃদ্ধি নয়, স্বচ্ছলতা নয় : উন্নয়নের গতিময় সূচকের সন্ধানে

মৈত্রীশ ঘটক

১

সেই আদ্যিকাল থেকে দেখছি, আমাদের দেশে আর্থিক নীতি-সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্কগুলো দুটো মূল বয়ানের যুগলবন্দিতেই ঘোরাফেরা করে। একদলের মন্ত্র বিকাশ, অন্যদলের দারিদ্র। এক দল যখনই দেখাতে যায় দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার কি চমৎকার বা চিনের সঙ্গে দৌড়ে আর কতটা এগোলাম আমরা অন্য দল অমনি হিসেব কষে দেখিয়ে দেয়, সামাজিক সূচকগুলোর দৌড়ে আফ্রিকার কোনও গরিব দেশ কিংবা ঘরের পাশেই তুলনায় গরিব পড়শি বাংলাদেশও এগিয়ে আমাদের থেকে। ভারতের ক্রমবর্ধমান আর্থিক প্রগতির বিজয়গাথার দৃপ্ত তালের ব্যান্ডপার্টির পাশেই নাছোড় সানাইয়ের মত বাজতে থাকে সামাজিক সূচকে ভয়াবহ দশার করুণ পাঁচালি।

ধরুন আপনি একটা সফ্টওয়্যার তৈরি করলেন, উদ্দেশ্য ভারতের অর্থনীতি নিয়ে লেখা কোনও নিবন্ধের ঝোঁক বোঝা। প্রথম শিবিরের লেখা হলে ঘুরে ফিরে আসা শব্দ বা 'কি-ওয়ার্ড' হবে নিঃসন্দেহে 'বিকাশ' আর 'সংস্কার'। আর উল্টো শিবিরের জন্য? কেন, 'দারিদ্র' আর 'অসাম্য'! আর যে কোনও ঝগড়ারই ধর্ম প্রতিপক্ষের যুক্তি অনুধাবন না করে, তাকে একটা বাঁধা ছকে ফেলে তার বুদ্ধি, জ্ঞান বা নীতিবোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলা। দারিদ্র বা মানব কল্যাণ শব্দগুলো উচ্চারণ করেছেন কি, আপনি হলেন 'ঝোলাওয়ালা' বামপন্থী। আর্থিক বৃদ্ধির জাদুমন্ত্রই যে দারিদ্র হটানোর একমাত্র উপায় সে আপনার মোটা মাথায় ঢোকে না, কিংবা আরও খারাপ, হয়তো গরিবদের গরিব রেখে দিতেই বেশি উৎসাহী আপনি। হয় এখনো মেনে নিতে পারেননি যে সারা পৃথিবী থেকে সমাজতন্ত্র উঠে গেছে অথবা দারিদ্র পসরা করে পশ্চিমের বাজারে বই বিক্রী করা বা এনজিও-র জন্যে ফান্ড তোলাই আপনার আসল উদ্দেশ্য!

উল্টোদিকে কোনোক্রমে যদি বৃদ্ধি বা সংস্কারের কথা বলে ফেলেন, বা সরকার-কেন্দ্রিক

উন্নয়নের মডেলের বাইরে ভাবেন ব্যাস, তাহলেই আপনি নব্য-উদারতন্ত্রের ধ্বজাধারী, মুক্ত বাণিজ্যের বা বিশ্ব-পুঁজির দালাল, বা রাহুল গান্ধী কথিত মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তোলা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক স্লোগান "স্যুট-বুট কি সরকারের" ভাষায়, একজন "স্যুট-বুটওয়ালা"। আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য হল গরিবের মুখের ভাত কেড়ে, তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে, বড় কর্পোরেটগুলোর পকেট ভরতে সাহায্য করা। হয় গরিবদের নিয়ে আপনার কোন মাথা ব্যথা নেই, নয়তো আপনি আজও বিশ্বাস করেন চুঁইয়ে-পড়া তত্ত্বের অলৌকিক ক্ষমতায় অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রসাদে একদিন না একদিন দূর হটবেই গরিবি।

তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখলে, এই দুই বয়ান দুটো আলাদা অভীষ্ট বা লক্ষ্যের কথা বলে। কিন্তু ভারতের পটভূমিতে শুধুমাত্র বৃদ্ধির হার আর আর্থিক বিকাশ নিয়েই কথা বলে গিয়েছেন, দারিদ্র দূরীকরণে বৃদ্ধির ভূমিকার কথা একবারও তোলেননি, এমন অর্থনীতিবিদ বা আলোচক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিছুদিন আগের জগদীশ ভগবতী বনাম অমর্ত্য সেনের সেই বহুচর্চিত বিবাদের কথাই ধরা যাক। তাঁদের যে বইগুলো থেকে বিতর্কের সূত্রপাত সেগুলো যদি একটু খুঁটিয়ে পড়ে দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে, অভীষ্ট নিয়ে তাঁদের মতবিরোধ নেই। দুজনেই চান দারিদ্র কমাতে। তাঁরা আলাদা হয়ে যান মূলত তা কোন পথে সম্ভব হবে, যা আমাদের দেশের অর্থনীতি কী ভাবে কাজ করে তা নিয়ে মৌলিক মতভেদের কারণে।

আসলে আর্থিক বৃদ্ধি-কেন্দ্রিক বয়ানটির সমস্যা হল, দারিদ্র দূরীকরণ বা সামাজিক সূচকের মানোন্নয়নের জন্য আর্থিক বৃদ্ধি অপরিহার্য ঠিকই, কিন্তু শুধু সেটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের বহুকাঙ্খিত ১০ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধির হারের কথাই ধরা যাক। এই হারের চক্রবৃদ্ধিতে যদি বাড়ে, তাহলে আয় দ্বিগুণ হতে লাগবে সাত বছরের একটু বেশি। কিন্তু মুশকিল হলো, দারিদ্ররেখা এতটাই নীচে ধরা হয়, দ্বিগুণ হলেও মানুষ দরিদ্রই থেকে যায়। হিসেব কষলে দেখা যাবে, ঠিক দারিদ্রসীমায় বাস করেন যে মানুষটি, তাঁকে শুধুমাত্র এ দেশের বর্তমান মাথাপিছু গড় আয়ের (সারা বিশ্বের নিরিখে যেটা রীতিমত কম) সমস্তরে নিয়ে আসতেই টানা ২৬ বছর ধরে ১০ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধির হার ধরে রাখতে হবে; দুনিয়ার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোনও দেশের টানা সিকি শতক ধরে দুই অংকের বৃদ্ধির

হার (দশ শতাংশ বা তার বেশি) ধরে রাখার নিদর্শন নেই। এমন কি টানা সাত বছর এই হারে বৃদ্ধির (যাতে আয় দ্বিগুণ হবে) উদাহরণও বিরল। আর্থিক বৃদ্ধি আচ্ছে দিন আনতে পারে ঠিকই, তবে তার টিকির দেখা পেতেও অন্তত সেই সিকি শতক হা পিত্যেশ করে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। দরিদ্র মানুষকে শুধু বৃদ্ধির ভরসায় রেখে দেওয়া বা বলা এখন কষ্ট করো, পরের জন্মে তোমার ভালো হবে, প্রায় একইরকম।

পুনর্বণ্টন-কেন্দ্রিক বয়ানের সমস্যা, শুধুমাত্র পুনর্বণ্টনের উপরেই জোর দিলে গরিবদের পরিস্থিতিতে কোনও বাস্তব পরিবর্তন আসা অসম্ভব। বড়লোকদের ঘাড়ে করের বোঝা চাপিয়ে রাজকোষ ভরার ভাবনাটা সুখকর, সন্দেহ নেই। এবং তাতে নীতিগত কোন আপত্তি অন্তত আমার নেই। মুশকিল হলো, ভারতের যে ধনীরা এখন নিয়মিত বিশ্বের সবচেয়ে বিত্তবানদের তালিকা উজ্জ্বল করছেন, তাঁদের মিলিত সম্পদ ২০১২ সালে জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশের বেশি নয় (নব্বইয়ের শতকে এটাই ছিল মাত্র ১ শতাংশ)। এ বার ধরা যাক এঁদের সবার সমস্ত টাকাকড়ি নিয়ে গরিবদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হল। গরিব বলতে এখানে দারিদ্রসীমায় বা তার নিচে বাস করা ৩৫ কোটি ভারতীয়ের কথাই ধরলাম। প্রত্যেকের ভাগে বর্তমান দারিদ্রসীমার নির্ধারণ মূল্যটুকুর থেকে খুব বেশি পড়বে না। আর তার চেয়েও বড় কথা, সেটা কিন্তু এককালীন আয়। একবার স্বর্ণডিম্ব প্রসবকারী হাঁসটিকে জবাই করলে, আর তাকে পাওয়া যাবেনা – সঞ্চিত ধন সম্পূর্ণ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে বুঝলে হয় ধনসঞ্চয় বন্ধ হবে, বা তা সরকারের নাগালের বাইরে কোথাও সরিয়ে নেওয়া হবে। তাই শুধু পুনর্বণ্টনের ওপর ভরসা করলে, দারিদ্রের সমবন্টন হবে, তাতে বড়লোকরা তো উচিত শিক্ষা পেল এই গোছের আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু গরিবের অবস্থার বিশেষ ফারাক হবে না। এর আরেকটা উদাহরণ আমরা আমাদের রাজ্যে দেখেছি ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে। ভূমিসংস্কার কাম্য ছিল, তার সুফলও পাওয়া গেছে। কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমান যা, তাতে আমূল পুনর্বণ্টন করেও দরিদ্র এবং ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার খুব উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়।

এর মানে একথা নয় যে বৃদ্ধি বা পুনর্বন্টন জরুরি নয়। দুটোই জরুরি, এবং পরস্পরের পরিপূরক, কিন্তু শুধু একটার ওপর ভরসা করলে বিপদ। বৃদ্ধি বা পুনর্বন্টনে মধ্যে শুধু

একটিমাত্র পথের ওপর নির্ভর করলে কি হতে পারে সেটা বোঝাবার জন্যে দুটো চরম উদাহরণ পেশ করলাম মাত্র। দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র দূর করতে গেলে আর্থিক বৃদ্ধি সত্যিই জরুরি, এটুকু অন্তত স্যুটবুটওয়ালারা ভুল বলেন না। শেয়ার-বাজারের উল্লাসনৃত্যের জন্যে নয়, বা বিশ্বের সর্বাধিক ধনীর তালিকায় আবার কতজন ভারতীয় স্থান পেলেন বলে নয়, অর্থকরী কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর কারণেই অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রয়োজন। কিন্তু এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্যে গরিব মানুষদের মানবিক মূলধনের, অর্থাৎ, সোজা কথায় বলতে গেলে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত মৌলিক মানবসম্পদের প্রয়োজন। স্যুট-বুট ওয়ালারা ভুলে যান, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সুযোগ তৈরী করে এ যেমন সত্যি কথা, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার স্বচ্ছল ও দরিদ্র শ্রেণীর ক্ষমতায় বড় ফারাক থাকলে, দারিদ্র কমবে অতি ধীরগতিতে আর অসাম্য বাড়বে।

আসলে আমাদের উন্নয়নের যে সূচকগুলো, তার অনেগুলোই বড্ড স্থিতিশীল। কারোর বর্তমান আয় কত, শিক্ষার স্তর কি বা স্বাস্থ্যের মান কিরকম সেটা দিয়ে ভবিষ্যতে সে বা তার সন্তান-সন্ততি কেমন থাকবে, তা সব সময়ে ঠিকমত বলা যায়না। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ফলে দারিদ্র যদি এক প্রজন্ম বা দুই প্রজন্মের বেশী স্থায়ী না হয়, তাহলে বলাই যায় বৃদ্ধি বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের জন্যে কাম্য। কিন্তু অর্থনীতির এক স্তরে তরতরিয়ে বৃদ্ধি হতে থাকছে, আর অন্য স্তর আটকে আছে দারিদ্রে এবং অশিক্ষায়, তাহলে তা বলা যাবেনা। তাই সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার দীর্ঘমেয়াদী মানোন্নয়নই যদি উন্নয়নের লক্ষ্য হয় তাহলে প্রয়োজন এমন এক সূচকের যাতে আর্থিক সচলতা (economic mobility) ধরা পড়ে। যেমন, দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষায় দুই প্রজন্মের মধ্যে অর্থনতিক অবস্থা, শিক্ষাগত মান এবং পেশাগত পরিবর্তনের তথ্য পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে এমন একটা সূচক তৈরী করা যায়, যাতে গড় আয় বা শিক্ষা কত বেড়েছে না দেখে উর্ধ্বমুখী সচলতা (upward mobility) ধরা পড়বে। এই সূচকের মধ্যে একটা বড় সময়ের পরিসরে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ধরা পড়বে। গবেষণার জগতে এইরকম সূচক অপরিচিত নয়, কিন্তু উন্নয়ন নিয়ে আমাদের দৈনন্দিন আলোচনায় সেগুলোর ব্যবহার এখনো খুবই সীমিত। বৃদ্ধি এবং দারিদ্র এমনকি অসাম্যের যে নানা সূচক আছে তাদের সবারই সীমাবদ্ধতা হল তাতে উন্নয়নের এককালীন স্থিরচিত্র ধরা পড়ে, কিন্তু আর্থিক সচলতার সূচকে

উন্নয়নের চলমান এক চিত্র ফুটে ওঠে।

বস্তুত, 'স্যুট বুট কি সরকার' কথাটা যে আজকের দিনেও একটা কার্যকরী রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে মান্যতা পাচ্ছে, এটাই দেখিয়ে দেয় যে আমাদের সমাজে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে অর্থনৈতিক গতিশীলতা কতটা কম। অর্থাৎ কিনা, বাবা-মায়ের প্রজন্ম থেকে সন্তানের প্রজন্মে আর্থিক অবস্থায় বদল কম, পেশা নির্বাচনেও তাই। গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা যদি আরও বেশি করে স্যুট-বুট পরা উচ্চ দক্ষতার কাজের দিকে যাওয়ার সুযোগ পেত, তাহলে এ স্লোগান আজ ধারে কাটত না। দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ শুধু নিজের খাওয়া-পরা নয়, সব মা-বাবার মত সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তিত। তাঁরা চান তাঁদের সন্ততি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে তাঁদের থেকে অনেক বেশি উন্নতি করুক। দরিদ্র শ্রমিক বা কৃষকের সন্তান শিক্ষার সোপান বেয়ে দক্ষ শ্রমিক বা পেশাদার বা ব্যবসায়ী হিসেবে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেনীতে উত্থান করবে, এই হলো অর্থনৈতিক সচলতার মূল কথা। আর তাই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের ছেলেমেয়েদেরও যদি স্বচ্ছলতর পেশায় ঢুকতে পারার সুযোগ থাকে, তাহলে কেনই বা তাঁরা 'স্যুট বুট'-পরিহিত পেশাদার শ্রেণীর ওপর বিরাগ পোষণ করবেন?

কার্যত, কম-দক্ষতা থেকে মাঝারি দক্ষতার কাজে সরে এলে মজুরির হার বেড়ে যায় দ্বিগুণেরও বেশি। আবার মাঝারি দক্ষতার কাজ থেকে বেশি দক্ষতার কাজে গেলে একই ব্যাপার। একজন অদক্ষ শ্রমিকের সন্তান যদি উচ্চ পর্যায়ের দক্ষতা অর্জন করতে পারে, তাহলে এক প্রজন্মের মধ্যেই এক জনের ব্যক্তিগত আয় চার গুণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাজার তাদের জন্যই সুযোগ তৈরি করে যাদের এই মৌলিক পুঁজিটুকু রয়েছে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ফলে তৈরী হওয়া অর্থনৈতিক সুযোগ দরিদ্র শ্রেনীর শিশুদের আয়ত্বে আনতে গেলে, তাদের মানবসম্পদে বিনিয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু বাজারের যুক্তি যেহেতু ফেলো কড়ি মাখো তেল, বাজারের হাতে ছেড়ে দিলে সামাজিক ভাবে লাভজনক হলেও, এই বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হবেনা। তাই, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ প্রয়োজন। আর এই কারণেই শুধু বৃদ্ধি নয়, পুনর্বন্টনেরও প্রয়োজন কারণ রাষ্ট্রের এই বিনিয়োগের জন্যে আর্থিক সঙ্গতি প্রয়োজন। সেন-ভগবতী বিতর্কে সেনের বক্তব্য মানবসম্পদে বিনিয়োগ প্রয়োজন, তা ছাড়া অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ধরে রাখা যাবেনা, আর ভগবতীর

বক্তব্য, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি প্রয়োজন, কারণ করব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের আর্থিক সঙ্গতি না বাড়লে, মানবসম্পদে বিনিয়োগ হবেনা। অর্থাৎ, বৃদ্ধি এবং দারিদ্র দূরীকরণ পরস্পরের পরিপূরক, এবং এদের মধ্যে যোগসেতু হলো দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক সচলতা বৃদ্ধির জন্যে মানবসম্পদে বিনিয়োগ। আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়ানো এবং দারিদ্র কমানোর লক্ষ্যের ভিতরে যে বিরোধ আছে বলে মনে হয় বৃদ্ধি বনাম পুনর্বণ্টন শিবিরের ঝগড়াঝাঁটিতে, সেটার সমাধান লুকিয়ে আছে এখানেই।

২

এই সব কারণেই আমাদের সাম্প্রতিকতম বাজেটে সামাজিক ক্ষেত্রে বরাদ্দ ছাঁটাই নিয়ে যথেষ্ট চিন্তার কারণ আছে। জানি কেউ কেউ বলবেন, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে রাজ্যগুলোর বরাদ্দ কত কত বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু রাজ্যগুলোর নিজেদের মধ্যে মানব উন্নয়ন তথা প্রশাসনের গুণমানের নিরিখেই যে বিপুল তারতম্য (মনে রাখবেন, সাম্প্রতিক সবকটা বড় দুর্নীতির আঁতুড় কিন্তু ছিল রাজ্যগুলোই) রয়েছে, সেটা মাথায় না রাখলে কোনও কিছুই করা সম্ভব নয়। যতদিন না প্রতি রাজ্যে প্রকল্প রূপায়ণে তত্ত্বাবধান আর মূল্যায়নের যথাযথ পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে, ভালো কাজ পুরস্কৃত করার মত সদর্থক পদক্ষেপ করা হচ্ছে, শুধু ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে আর রাজ্যের বরাদ্দ বাড়িয়ে কোনও কাজের কাজ হওয়ার নয়।

আর তাছাড়া, বাজেট বরাদ্দ মানবিক পুঁজি তৈরির অনেকগুলো আবশ্যিক পরিস্থিতির মধ্যে একটা মাত্র। দেশে শিশুশিক্ষার হাল নিয়ে সাম্প্রতিক এএসইআর রিপোর্টগুলোয় (Annual Status of Education Report) একবার চোখ বোলালেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। স্কুলের খাতায় কজনের নাম লেখা আছে, পাশের হার, বা কত বছর শিক্ষালাভ করেছে এই সব না দেখে এই রিপোর্টে সমীক্ষকরা সারা দেশের নানা স্কুলে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করেন কিছু পরীক্ষা নিয়ে এবং তার ফল থেকে বিশেষত গ্রামীন অঞ্চলে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার মানের যে ছবি ফুটে ওঠে, তা বেশ আশংকাজনক। শুধুমাত্র সরকারী খাতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলে দিলেই এই সমস্যার সমাধান হবেনা।

শিক্ষা এবং সামাজিক পরিষেবার অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামো এবং কর্মপদ্ধতিতে আমূল সংস্কারের প্রয়োজন। একথা যেমন সত্যি, বাজেট বরাদ্দ কাটার পথেও নিশ্চয়ই সমাধানের পথ নেই।

মোদী সরকারের সাম্প্রতিক বহু ঘোষণাই (যেমন 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচি) যে চিনা অর্থনৈতিক মডেল থেকে অনুপ্রাণিত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের দেশে চিনের অন্ধ ভক্ত হয় সাধারণত দু'ধরণের লোক (আপাতদৃষ্টিতে যাদের মধ্যে মিলের লেশটুকুও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর); ব্যবসায়ীরা আর মাওবাদীরা। অর্থাৎ কিনা চলতি ব্যবস্থা যদি পছন্দ না হয় তো দুটো রাস্তা খোলা। হয় বিপ্লবের ছক কষুন, যার জন্য মাওয়ের চেয়ে বড় গুরু আর নেই। আর নয়তো ব্যবসার পথ সুগম করে আর্থিক বৃদ্ধি আনার চেষ্টা করুন, যে ক্ষেত্রে আপনাকে পথ দেখাবে দেং জিয়াওপিংএর নীতি।

একথা ঠিক যে বিজেপি তাদের মত করে সংস্কৃতিক বিপ্লবে বিশ্বাস করে, রঙ না হয় তার লাল না হয়ে গেরুয়া! কিন্তু অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে মোদীর পছন্দের চিন-মডেলের গুরুঠাকুর দেং জিয়াওপিং এবং তাঁর উত্তরসুরীরা । এই মডেলের মূল কথা হল প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) টেনে আনা, আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতের ফাঁস সরানো, শ্রমিক অসন্তোষ কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদনের প্রক্রিয়া মসৃণ রাখা, ব্যবসার প্রয়োজনে কৃষকদের থেকে "জমি অধিগ্রহণ" নিশ্চিত করা, এবং পরিবেশ আন্দোলন বা মানবাধিকার কর্মীদের দাবিয়ে রাখা! আয়ভিত্তিক আর্থিক বৃদ্ধিই যদি লক্ষ্য হয় তাহলে চিনেদের স্বৈরাচারী আর্থিক নীতির কার্যকারিতা প্রশ্নাতীত।

কিন্তু এই সব আলোচনায় যে তথ্যটা হামেশাই চাপা পড়ে যায় তা হল, চিনে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত দড়, নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকারও সুনিশ্চিত। ভারতে যে চরম দারিদ্র দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত, তেমনটার অস্তিত্বই নেই প্রায়। সামগ্রিকভাবে শিক্ষা-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নীতিগুলিই তুলনায় অনেক ভালো সেখানে।

কাজেই, সেখানকার স্বৈরাচারী ধাঁচটি স্রেফ তুলে এনে নিজেদের আর্থিক নীতির জায়গায় বসিয়ে দিলাম, কিন্তু তার থেকে তৈরি হওয়া আর্থিক বৃদ্ধি সুষম ভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার বা সামাজিক সুরক্ষার কোনও ব্যবস্থা করলাম না, সেটা বেশ অবাস্তব প্রস্তাব। ভারতের

গণতান্ত্রিক কাঠামো সচল, বিশৃঙ্খল। তার উপর চিনের চূড়ান্ত কেন্দ্রায়িত অর্থনৈতিক প্রশাসন ব্যবস্থা কোনোমতে চাপিয়ে দিতে পারলেই কেল্লাফতে, হাতে হাতে সুশৃঙ্খল অর্থনীতি আর রাজনৈতিক স্বরাজের ধারণা মিলে গেল, এমনটা নাও হতে পারে। এ সব দাবি শুনলে সেই প্রখ্যাত লেখক আর লাস্যময়ী নর্তকীর পুরনো গল্পটা মনে পড়ে যায়। নর্তকী লেখককে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আসুন সন্তান জন্ম দিই, রূপে সে হবে মায়ের মত, বুদ্ধিতে বাবার সমতুল। লেখকের সরস জবাব, উল্টোটাও তো হতে পারে!

তত্ত্ব ছেড়ে তথ্যের দিকে নজর ফেরালে দেখা যাবে, ইউপিএ-র শেষ বছরগুলোতে ভারতে আক্ষরিক অর্থেই 'স্ট্যাগফ্লেশন' পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, অর্থাৎ বৃদ্ধির মন্থর হার আর মুদ্রাস্ফীতির ভয়াল রাজজোটক। তার সঙ্গে জুড়েছিল নীতিপঙ্গুতার অভিযোগ, অতীতের চমৎকার রেকর্ডেও যা মোছা যায়নি। আর এই যুগলবন্দীর দাক্ষিণ্যেই কিন্তু জনমতের হাওয়া ঘুরে যায় নরেন্দ্র মোদীর দিকে। এ বার সাধারণ মানুষ যদি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সত্যি সত্যি 'আচ্ছে দিনে'র স্বাদ না পায়, তাহলে এই সমর্থনও ঘুরে যেতে সময় লাগবে না, এটুকু আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (যা নিয়ে আমাদের সত্যিই গর্ব করা সাজে) নিশ্চিত করে।

মোদীর মত পোড় খাওয়া রাজনীতিক এটা জানেন না, হতে পারে না। তাহলে তাঁর অর্থনৈতিক পরিকল্পনাটা কি? আর এর মধ্যে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র ভূমিকাই বা কতটা? বিশেষ করে, এফডিআই বাড়লেই যে বৃদ্ধির হার বাড়বে তথা দারিদ্র কমবে, এমনটাই বা তিনি কী ভাবে ধরে নিচ্ছেন?

প্রথমত, এ ধরণের প্রচার কর্মসূচিগুলোর বাস্তব সুফল কিছু থাকে বলে প্রমাণ অল্পই। উদাহরণ হিসেবে ২০১৩ সালের 'ইকনমিক ফ্রিডম অফ দ্য স্টেটস অফ ইন্ডিয়া' রিপোর্টটি দেখা যেতে পারে। রিপোর্ট বলছে, ভাইব্র্যান্ট গুজরাট সামিটের মত সম্মেলনগুলিতে যে সব বাণিজ্যিক চুক্তি সই হয় সেগুলির প্রকল্পে বাস্তবায়িত হওয়ার হার আসলে খুবই অল্প। ২০১০-১১ অর্থবর্ষে সারা দেশে এই হার ছিল মাত্র ৬ শতাংশ, মোদীর গুজরাটে কিছু বেশি, ৮.৫ শতাংশ।

দ্বিতীয়ত, যদি ধরে নিই যে এই সব কর্মকাণ্ডে এফডিআই-এর পরিমাণ ভালোরকমই

বৃদ্ধি পেয়েছে, তাহলেও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে বর্তমানে এ দেশে মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ১.৩ শতাংশ ঢোকে এফডিআই-এর মাধ্যমে, যা আন্তর্জাতিক গড়ের তুলনায় নগণ্য (মাথা পিছু আয়ের ভিত্তিতে তুলনাযোগ্য দেশগুলিকে ধরলে যে গড় দাঁড়ায়)। কাজেই এ ধরনের প্রচার কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারে প্রচুর গতি আসবে, এমনটা ভাবা একটু বাড়াবাড়ি।

তৃতীয়ত, ভারতে কি অন্যত্র, বৃদ্ধির হারের উপর এফডিআই-এর প্রভাব যে একেবারে নিঃশর্তভাবে সদর্থক হবে, তারও কিন্তু নিশ্চয়তা নেই। যেটুকু প্রমাণিত, তা হল, কোনও দেশ এফডিআই থেকে কতটা ফায়দা তুলতে পারবে তা নির্ভর করে দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি (যেমন শেয়ার বাজার) কতটা শক্তিশালী তার উপর।কাজেই, 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র মত প্রক্রিয়াগত সংস্কারের বদলে জোরটা পড়া দরকার কার্যকরী এবং আমূল নীতি সংক্রান্ত সংস্কারে। তা না হলে, এফডিআই-এর পরিমাণ যতই বাড়ুক তা দেশের বৃদ্ধির হারে আদৌ কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে কিনা তা একেবারেই স্পষ্ট নয়, বিশেষ করে যখন এ দেশের অর্থনীতির অনুপাতে এফডিআই-এর অবদানটাই এত নগণ্য।

আর শেষে, অন্তত ভারতের প্রেক্ষিতে, আয় বৃদ্ধি পেলেই কর্মসংস্থান বা মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে বা রাতারাতি দারিদ্র কমেছে, এমন নিদর্শন বিরল। অথচ দেশের বৃহত্তর জনগণের কাছে 'আচ্ছে দিনে'র মাপকাঠি কিন্তু এটাই।

গত দুই দশকে আর্থিক বৃদ্ধির কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ দারিদ্রসীমার উপর উঠে এসেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু পাশাপাশি এটাও সত্যি যে দারিদ্র কমানোর ক্ষেত্রে এ দেশে আর্থিক বৃদ্ধির কার্যকারিতা চিন বা অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের তুলনায় অনেকটাই কম। পিউ রিসার্চ সেন্টারের (Pew Research Centre, 2015) একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট দেখাচ্ছে, আর্থিক সংস্কার পরবর্তী ভারতে দারিদ্র কমছে ঠিকই, কিন্তু তার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণি কলেবরে বাড়েনি। বরং দিনে দিনে নিম্ন আয় গোষ্ঠীর আয়তন ফুলেফেঁপে উঠেছে। অর্থাৎ, অতি-দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের অবস্থা খানিক উন্নত হয়েছে, কিন্তু অর্থনৈতিক সচলতা বলতে আমরা যা বুঝি, অর্থাৎ দরিদ্র শ্রমিক বা কৃষকের সন্তান শিক্ষার সোপান বেয়ে দক্ষ শ্রমিক বা পেশাদার হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেনীতে উত্থান করবে, এ তার পক্ষে জোরদার তথ্য-প্রমাণ

নয়। ২০০১ সালে ভারতে অতিদরিদ্র, দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেনীতে জনসংখ্যার ৩৫%, ৬৩%, এবং ১.৫% ছিল, আর ২০১১ সালে তা হয়েছে যথাক্রমে ২০%, ৭৭%, আর ২.৫%।[i] অর্থাৎ মধ্যবিত্ত ভারতীয়ের সংখ্যা ১ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে মাত্র ৩ শতাংশ, যদিও অতিদরিদ্র শ্রেনীতে জনসংখ্যা কমেছে। চিনের ক্ষেত্রে ২০০১ সালে অতিদরিদ্র, দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেনীতে জনসংখ্যার ৪১%, ৫৬.৫%, এবং ২.৫% ছিল, আর ২০১১ সালে তা হয়েছে যথাক্রমে ১২%, ৬৬%, আর ১৭.৫%। অর্থাৎ, অতিদরিদ্র ও দরিদ্র শ্রেনীতে মোট জনসংখ্যার অনুপাত এই দুই দেশে ২০০১ সালে প্রায় এক থাকলেও, অর্থনৈতিক সচলতার সূচকে চিন অনেকটা এগিয়ে গেছে গত এক দশকে। তার কারণ সেখানে একাধিক মাত্রায় সচলতার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে – তার মধ্যে, অতিদরিদ্র থেকে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত দুই শ্রেণীতে, এবং দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উত্থানের ছবি ফুটে উঠছে। তুলনায় ভারতে যেটুকু সচলতা তা অতিদরিদ্র থেকে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ। এর একটা বড় কারণ হল চিনের তুলনায় ভারতে একটা বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার কাছে মানবিক পুঁজির মৌলিক অধিকারগুলিই পৌঁছয়নি।

অধুনাবিখ্যাত গুজরাট উন্নয়ন মডেলটিই ধরা যাক। সে রাজ্যের ঈর্ষণীয় বৃদ্ধির হার মানব উন্নয়ন সূচকগুলিতে স্পষ্টতই বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাচ্ছন্দ্যের সূচকে বাকি সব রাজ্যের থেকে এগিয়ে থাকলেও, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হারে গুজরাত অনেকটা পিছিয়ে। শুধু তাই নয়, শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং মানব-বিকাশ সূচকে তার স্থান প্রথম দশটি রাজ্যের মধ্যেও নয়। যাঁরা গুজরাট মডেলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে মোদীকে সমর্থন করেছিলেন, এবং এখনো আচ্ছে দিনের প্রতিশ্রুতিতে আস্থাশীল, তাঁরা ভাবতেই পারেন এ হলো মোদী-বিরোধী শিবিরের প্রচার মাত্র। কিন্তু উপরোক্ত তথ্যটি অধুনা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজনের নেতৃত্বে গঠিত অর্থ-মন্ত্রকের এক ২০১১ সালের রিপোর্ট থেকে নেওয়া। প্রচার বাদ দিলে গুজরাত মডেলের মূল ভিত্তি হলো পুঁজি-নিবিড় ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রকল্পে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার প্রভাব স্বভাবত সীমাবদ্ধ।

তবে ইউপিএ জমানায় ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও অবশ্য একই কথা খাটে। দারিদ্র কমানোর একাধিক যোজনা নিয়েও সে সময় মোট জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার বছরে

৭.৬ শতাংশর কাছাকাছি ধরে রাখা গিয়েছে। অথচ ২০০৪-১৩ সালের মধ্যে দারিদ্র কমার হার ছিল বছরে মাত্র ২.২ শতাংশ, মানব উন্নয়ন সূচকগুলিতে হেরফেরও নগণ্য। এর মানে এই দাঁড়ায় না যে দারিদ্র দূরীকরণে আর্থিক বৃদ্ধি জরুরি নয়। কিন্তু, সেই আর্থিক বৃদ্ধিকে দারিদ্র কমানোর কাজে লাগানোর ব্যবস্থাটা যথেষ্ট মজবুত ছিল না। আর তার নিট ফল, দারিদ্রসীমার নিচে থাকা জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের(মানে ৩৫ কোটিরও বেশি ভারতবাসী) কাছে কর্মসংস্থান আর মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে এই আর্থিক সংস্কারের সুফল পৌছেছে সেই চুঁইয়ে চুঁইয়ে, আর তার গতিটা আসলে ভয়ানক মন্থর।

আর্থিক বৃদ্ধির উপযোগী পরিস্থিতি তৈরি করা, তার প্রভাব সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া এবং দারিদ্র-বিরোধী যোজনাগুলিকে কার্যকরী ও স্বচ্ছ করে তোলার জন্য আশু প্রয়োজন পরিকাঠামোর খোলনলচে সংস্কার। তার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি শাসনযন্ত্রের সংস্কারও। মেক ইন ইন্ডিয়া আর স্বচ্ছ ভারত ইত্যাদি প্রচারমূলক কিছু প্রচেষ্টা এবং জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হিসেব করার ফর্মুলা পাল্টে আগের জমানার থেকে ২% বেশি বৃদ্ধির হার দেখানোর ম্যাজিক ছাড়া আচ্ছে দিনের স্লোগান বাস্তবায়িত হওয়ার কোনও স্পষ্ট রূপরেখা পাওয়া যাচ্ছে না। গরিব মানুষের কাছে ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আনা প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা একমাত্র স্বাগত পদক্ষেপ।

৩

এ তো গেল অর্থনৈতিক নীতির কথা। অসাম্য অনেক রকমের হয় আর তাই শুধু অর্থনৈতিক মাত্রা ব্যবহার করে সচলতা দেখলে চলবেনা। কেউ বলতেই পারেন সামাজিক (যেমন, জাত-পাত ভিত্তিক) বৈষম্য অর্থনৈতিক অসাম্যের থেকে বৃহত্তর সমস্যা। আবার এমনও ভাবা যেতে পারে সামাজিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণীরা যে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে আছেন, তার জন্যে অর্থনৈতিক অসাম্যের ভূমিকা সামাজিক বৈষম্যের থেকে বেশি। খবরের কাগজ খুললে দেশের এখানে ওখানে জাত-পাত ব্যবস্থা এবং অস্পৃশ্যতার কুপ্রভাবের নানা নিদর্শন দেখা যাবে। এদিকে অনেকেই মনে করেন, চাকরি বা শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি জাতভিত্তিক না হয়ে অর্থনৈতিক

অবস্থা-ভিত্তিক হওয়া উচিত। মুশকিল হল, এই অবস্থান জাতভিত্তিক বৈষম্যজনিত অসাম্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, যা বাস্তবসম্মত নয়। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে দুই প্রজন্মের মধ্যে যদি আর্থিক, পেশাগত এবং শিক্ষাগত তুলনা করা হয় (যেমন, বাবা স্বল্পশিক্ষিত হলেও পুত্র উচ্চশিক্ষিত হবার সম্ভাবনা কত) তাহলে খুব সাম্প্রতিক কাল বাদ দিলে, ঐতিহসিকভাবে অগ্রসর জাতিদের মধ্যে অনগ্রসর জাতিদের তুলনায় সচলতা অনেক বেশি। অর্থনৈতিক বিকাশের সাথে সাথে সব শ্রেণীর মধ্যেই অর্থনৈতিক সচলতা বাড়ে, দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরও উন্নতি করার সুযোগ এবং সম্ভাবনা আগের থেকে বেশি হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থানই যদি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে এই সচলতার হার সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করার কথা নয়। তাই তথ্য-পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধু অর্থনৈতিক অবস্থান নয়, অর্থনৈতিক সচলতার পেছনে সামাজিক বৈষম্যের ভূমিকা অগ্রাহ্য করা যায়না।

নীতিগত দিক ছেড়ে যদি ফলাফল দেখি, তাহলেও মানতে হবে স্বাধীনতার পর প্রায় সাত দশক ধরে তফশীলি জাতি ও উপজাতিদের জন্যে আর দুই দশক অন্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীদের জন্যে সংরক্ষণ নীতি থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনের উচ্চপদে ২০১১ সালে তাঁদের সামগ্রিক অনুপাত মাত্র ২৩%, যদিও জনসংখ্যায় তাঁদের অনুপাত প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। কেউ ভাবতে পারেন, তার মানে সংরক্ষণের হার আরো বাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ, কিন্তু শিক্ষা এবং চাকরির ক্ষেত্রে এই শ্রেণী থেকে যথাসংখ্যক যোগ্য প্রার্থী খুঁজে পাওয়া অনেক সময়েই দুঃসাধ্য, তাই অনেক সংরক্ষিত আসন খালি পড়ে থাকে। তাই শুধু সংরক্ষণ নীতি দিয়ে সামাজিক ভাবে অনগ্রসর জাতিদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সচলতা বাড়ানো কঠিন।

জাতিভিত্তিক অর্থনৈতিক সচলতা নিয়ে যে সমীক্ষার কথা একটু আগে বলছিলাম, তার থেকে পাওয়া এক চিলতে সুখবর হল গত দুই দশকে অনগ্রসর শ্রেণীদের মধ্যে অর্থনৈতিক সচলতা আগের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে, এখন তা প্রায় অগ্রসর শ্রেণীদের সাথে তুলনীয়। অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে বেসরকরি ক্ষেত্রে চাকরি এবং শিক্ষার সুযোগের বিস্তার এর পেছনে একটা বড় কারণ বলে মনে করা হয়। যেমন, আশির দশকের গোড়া থেকে সংগঠিত সরকারী ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান প্রায় বাড়েনি, এদিকে

সংগঠিত বেসরকারী ক্ষেত্রে তা বেড়েছে প্রায় ৬০%।

বিকাশ বনাম পুনর্বণ্টন বিতর্কের পুরনো কাসুন্দি ছেড়ে অতএব সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার দিকে নজর ঘোরানোটা আশু দরকার। নীতি বিকাশকেন্দ্রিকই হোক বা পুনর্বণ্টন-কেন্দ্রিক, তার মুল্যায়নের মাপকাঠি হোক তা সামাজিক গতিশীলতা আনতে কতখানি সাহায্য করছে সেটা। স্যুট-বুট আর ঝোলা নিয়ে তর্জা ছেড়ে তাই দরিদ্র পরিবারের শিশুদের স্কুলব্যাগ আর স্কুল ইউনিফর্মের কথা হোক।

এই নীতি বনাম ওই নীতি নিয়ে যুক্তি-তক্কো চলতে থাক, কিন্তু মনে রাখতে হবে বৃদ্ধির হারের শুকনো পাটিগণিত নয়, এই শিশুদের যাত্রাপথের যে চলমান চালচিত্র, সেটাই উন্নয়ন। তারাও যদি বড় হয়ে তাদের পিতা-মাতার মত স্বল্প মজুরির পেশায় অদক্ষ মজুর হিসেবেই থেকে যায়, তাহলে হাজারটা সূচকের তালিকায় বিশ্বে ভারত প্রথম সারিতে বলে সেই দৈন্য ঢাকা যাবেনা। আর তারা যদি শিক্ষার সেতু বেয়ে দক্ষতা নির্ভর পেশায় ঢুকতে পারে, তাহলে অসাম্য আর দারিদ্র-কেন্দ্রিক আখ্যান তার ধার হারাবে। 'আচ্ছে দিন'-এর ধারণার মধ্যে ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ নিহিত আছে, যার একটা দিক নিশ্চয়ই হলো অর্থনৈতিক সচলতা।

তবে, অনতিদূর ভবিষ্যতে উন্নয়নের নীতি নিয়ে নতুন ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে খুব একটা আশার আলো দেখিনা। গুজরাট মডেলের অলৌকিক সাফল্যের প্রচারে ভোটারদের মুগ্ধ করে ক্ষমতায় আসার পর প্রায় দেড় বছর হয়ে গেল মোদী সরকারের । এখন অবধি উল্লেখযোগ্য কোন অর্থনৈতিক সংস্কার রূপায়িত হয়নি, অর্থনীতির পালেও হাওয়া লাগেনি । এর ফল যেটা হচ্ছে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বের কিছু মৌলিক ফাটল ক্রমশঃ দৃশ্যমান হয়ে পড়ছে। এর উদাহরণ গুজরাতে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন, গো-বলয়ে গো-মাংসের রাজনীতি, এবং ভিন্নমত নিয়ে অসহিষ্ণুতা। দেশের সর্বত্র, যার মধ্যে আমাদের রাজ্যও আছে, বিবিধের মধ্যে মিলনের পরিবর্তে বিবাদের মলিনতা ।[ii] নাগরিকদের মৌলিক কিছু স্বাধীনতা না থাকলেও উন্নয়ন সম্ভব (চিন যার সাম্প্রতিক উদাহরণ)। কিন্তু সেই উন্নয়ন হবে ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীদের পছন্দের উন্নয়ন, সেখানে বৃদ্ধি না দারিদ্রহ্রাস না অর্থনৈতিক সচলতা সেই বিতর্ক অবান্তর।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: মানবসম্পদের বিকাশ যেহেতু এই প্রবন্ধের একটা মূল বিষয়, তাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কিছু শিক্ষকের ঋণস্বীকার করার এই হলো মোক্ষম সুযোগ। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই পিনাকী মিত্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সরকার, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, মৃণাল দত্ত চৌধুরী, সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য, সঞ্জয় সুব্র্যমনিয়াম, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, এরিক ম্যাসকিন, স্টিভেন মার্গলিন, রবার্ট ব্যারো, রবার্ট লুকাস, প্রণব বর্দ্ধন, দীপেশ চক্রবর্তী, টিমোথি বেসলি, দেবরাজ রায়, এবং দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের কথা। লেখাটি পাঠযোগ্য হলে তার অনেকটা কৃতিত্বই মনীষিতা দাশের সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপের।

---

[i] ২০১১ সালের মূল্যসূচক ব্যবহার করে, দিনে যাঁরা ২ মার্কিন ডলারের কম অর্জন করেন, তাঁদের অতিদরিদ্র ধরা হচ্ছে। দরিদ্র বা নিম্নবিত্ত ধরা হচ্ছে যাঁদের দৈনিক আয় ২-১০ মার্কিন ডলার, আর মধ্যবিত্ত ধরা হচ্ছে যাঁদের দৈনিক আয় ১০-২০ মার্কিন ডলার। "মধ্যবিত্ত" শব্দটি যে আপেক্ষিক তা বোঝা যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দারিদ্ররেখা দিনে ১৬ ডলার।

[ii] খটকা লাগতে পারে, সংরক্ষণ নিয়ে এই আন্দোলন বিহার বা উত্তরপ্রদেশের মত অনগ্রসর রাজ্যে না হয়ে গুজরাতে হচ্ছে কেন? আগেই বলেছি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাচ্ছন্দ্যের সূচকে বাকি সব রাজ্যের থেকে এগিয়ে থাকলেও, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হারে গুজরাত অনেকটা পিছিয়ে। প্রচার বাদ দিলে গুজরাত মডেলের মূল ভিত্তি হলো পুঁজি-নিবিড় ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রকল্পে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রভাব স্বভাবত সীমাবদ্ধ।